স্বাধীন ভারতে উচ্চশিক্ষার অগ্রগতি ঃ একটি পর্যালোচনা

ড. শচীনন্দন সাউ

সূচনা ঃ

উচ্চশিক্ষা ধারণাটি স্বাধীন ভারতে এসেছে মূলতঃ ব্রিটিশ পরিচালিত ভারতবর্ষের স্তরভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে। বিদ্যালয় শিক্ষার শেষে যে শিক্ষার ধারা চালু ছিল ব্রিটিশ ভারতবর্ষে সেই ধারাটি অবিকৃত রেখে আমরা এখন উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছি। এখানে সাধারণ শিক্ষার পরিবর্তে বিশিষ্ট জ্ঞান ও বোধের শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে—এই অর্থে উচ্চশিক্ষাকে বিশিষ্ট শিক্ষা (Specialised Education) বলা যেতে পারে। এটাই যথার্থ, কেননা কোন স্তরের শিক্ষা উঁচু বা নিচু হতে পারে না। অবশ্য সাধারণ বা বিশিষ্ট হতে পারে। যেহেতু বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা ভিত্তিশিক্ষা এটা মজবুত হলেই পরবর্তী শিক্ষা শক্ত ও সফল হয়। এ জন্যই পাশ্চাত্য দেশে এই মৌলিক শিক্ষাস্তরে নিযুক্ত শিক্ষকদের অন্যান্য স্তরের শিক্ষকদের অপেক্ষা বেশি বেতন দেওয়া হয়ে থাকে যাতে তারা সামগ্রিক শিক্ষার ভিত সুদৃঢ় করে তুলতে উৎসাহ পান। এটা সর্বজনবিদিত যে, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা ভারতের পরিকল্পনা আমলে অর্থাৎ ১৯৫১ খ্রি. থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা সত্যই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এটাও স্বীকৃত সত্য যে, এই সকল প্রতিষ্ঠান পরিমাণগতভাবে যতটা বৃদ্ধি পেয়েছে গুণগতভাবে দেখলে তা কোনো অবস্থাতেই উল্লেখযোগ্য নয়। কেন এমন হল—এটা স্বাভাবিক প্রশ্ন। অন্যান্য স্তরের শিক্ষার ন্যায় তথাকথিত উচ্চশিক্ষার একটা তত্ত্ব আছে। তাছাড়া রয়েছে পরিকল্পনা। বিশ্বায়নের প্রভাবও কম উল্লেখযোগ্য নয়। অন্যান্য অনেক বিষয়ও রয়েছে যা এই স্তরের শিক্ষাকে প্রভাবিত করে। তাহলে কিভাবে উচ্চশিক্ষার অগ্রগতি আমরা পর্যালোচনা করব?

উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপটে বক্ষ্যমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল, বিদ্যালয় পরবর্তী স্তরের শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে এক বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা গড়ে তোলা।

আলোচনার সুবিধার্থে আমরা বর্তমান প্রবন্ধটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করব। প্রবন্ধটির দ্বিতীয় অংশে কিছু তাত্ত্বিক বিষয় আলোচনা হবে। এই অংশে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, এর গণতান্ত্রিক কাঠামো, পাঠ্যক্রম বিষয়ে কিছু কথা আলোচিত হবে। প্রবন্ধটির তৃতীয় অংশে থাকবে পরিমাণগতভাবে এই বিশেষীকৃত শিক্ষার ব্যাপকতা ও বিস্তার সম্পর্কিত আলোচনা। তাছাড়া, এর গুণগত দিক যেমন ন্যায়বিচার, পাঠ্যক্রমের ব্যাপকতা ও গভীরতা এবং সর্বোপরি শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টি আলোচিত হবে। প্রবন্ধটির চতুর্থ অংশে এই সকল বিশিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেসব সমস্যার মুখোমুখি—সে সম্পর্কে আলোকপাতের চেষ্টা হবে। স্বাভাবিকভাবে এই স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য

Scanned with CamScanner

পূরণে ঘাটতি, সমাজ ও পরিবেশ এবং এই শিক্ষার মেলবন্ধন, উচ্চশিক্ষা থেকে কি বাহ্যিক সুবিধা মানুষ পেয়ে থাকে, এই শিক্ষার প্রধান চালিকাশক্তি, ফলাফল, সামাজিক স্থিরতা ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচিত হবে। সর্বশেষ পঞ্চম অংশে থাকবে সমগ্র আলোচনার একটি সংক্ষিপ্তসার এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

কিছু তত্ত্বকথা ও অভিজ্ঞতা ঃ

শিক্ষা যেহেতু অবিরাম প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে মানুষের ভাব-ভাবনা ও আচরণগত পরিবর্তন ঘটে, তথাকথিত উচ্চশিক্ষাও এইসব ক্রিয়ার বাইরে হতে পারে না। এই শিক্ষার ভিত বিদ্যালয় শিক্ষা হলেও সমাজ, অর্থনীতি, পারিপার্শ্বিকতা তথা সমগ্র বিশ্ব এই শিক্ষার উপাদান হিসাবে কাজ করে। তখনই উচ্চশিক্ষা সার্থক ও ফলপ্রসূ হয় যখন এইসব দিকগুলির মেলবন্ধন ঘটে উচ্চশিক্ষার পাঠ্যক্রমে। তাই উচ্চশিক্ষা শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির তৃপ্তি (Utility) আনে না, তাকে সীমার বাইরে এক অসামান্য জ্ঞানের অধিকারী করে যার মধ্য দিয়ে সে যেমন সত্য ও বিজ্ঞানের আলো দেখে ঠিক তেমনিভাবে সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে সে বিচার-বিবেচনাক্ষম হয়। সত্যাসত্য বিচার করতে পারে এবং উদ্ভুত কোন সমস্যার মীমাংসাও তার পক্ষে করা সম্ভব হয়। এইভাবেই গণতান্ত্রিক কাঠামোয় উচ্চশিক্ষার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি তার আত্মগত বিকাশ এবং সমাজ তথা সারা বিশ্বের কল্যাণসাধনে সক্ষম হয়। ভারতবর্ষের প্রাচীন শিক্ষাধারায়, বিশেষতঃ বৌদ্ধযুগে নালন্দা, তক্ষশীলা ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় উল্লিখিত দিকটি মূর্ত হয়ে উঠেছিল এবং ভারতবর্ষ তার শিক্ষাগত আলোকদ্যুতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিল। এই সুপ্রাচীন শিক্ষাধারা সমুন্নত হলেও রাজনৈতিক এবং তথাকথিত ধর্মীয় কারণে তা ভারতবর্ষে ব্যাহত হয়েছিল, যার প্রমাণ মেলে মধ্যযুগে এবং ভারতবর্ষে ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর পত্তনের পর সুদীর্ঘ ব্রিটিশ শাসনকালে। ব্রিটিশ সরকার তাদের সংকীর্ণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে উচ্চশিক্ষা সহ সমগ্র শিক্ষার উদ্দেশ্য সমুচ্চ রাখতে দেয়নি। একটা সংকীর্ণ চাকরির উদ্দেশ্য ছাড়া ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার কোন উদ্দেশ্য ছিল না। এভাবে শিক্ষাকে উদ্দেশ্যগতভাবে ও পরিসরে সংকীর্ণ করে ফেলায় সার্বিকভাবে যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়েছে। যে উন্নত শিক্ষার আলোয় প্রাচীন ভারতবর্ষ সারা বিশ্বে প্রশংসিত ও নন্দিত হয়েছে ব্রিটিশযুগে সেই ভারতবর্ষ অবহেলিত ও নিন্দিত হয়েছে সারা বিশ্বের কাছে, অবশ্য ব্রিটিশ প্রবর্তিত মাধ্যমের সহায়তা নিয়ে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশযুগের অবসান ঘটেছে সত্য, দেশ এখন স্বাধীন, কিন্তু ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষাধারা আমরা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারেই কোন বিবেচনা না করেই অকুণ্ঠভাবে স্বাধীন ভারতে চালিয়ে যাচ্ছি। উচ্চশিক্ষাকে বলা হচ্ছে একটা সেবামূলক শিক্ষা (Tertiary Education), যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে কুশলী (Skilled) মানবশক্তি (Manpower) লাগবে তার যোগান দেবে। অন্য কোন মহৎ উদ্দেশ্যের গুরুত্ব প্রথাগতভাবে নেই। এই শিক্ষা বিভিন্ন ও বৈচিত্র্যমূলক পাঠ্যক্রমে তথ্য (Information) সৃষ্টি করে, তথ্যের যোগান বাড়ে এবং তা দিয়েই উন্নয়নের বিশেষতঃ

Scanned with CamScanner

অর্থনৈতিক উন্নয়নের বনিয়াদ তৈরি হয়। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে উচ্চশিক্ষার যে মহৎ উদ্দেশ্য জ্ঞানসৃষ্টি (Creation of Knowledge) তা ক্বচিৎ ঘটে। মানুষকে প্রজ্ঞাবান করে তোলা সে তো দুর অস্ত বা দুরের কথা। এভাবে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য যদি সংকীর্ণতার ঘেরাটোপে আবদ্ধ হয়ে যায় তাহলে মানুষের মুক্তি বা স্বাধীনতা কোথায়? তাছাড়া আমরা কি স্বাধীন দেশে এই ধরণের আত্মীকরণহীন কিছু ধ্যান-ধারণা ও তথ্য দিয়ে গড়া শিক্ষাব্যবস্থা আন্তরিকভাবে চেয়েছিলাম? এইরূপ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই জাগে। বুঝতে অসুবিধা হয় না—এই ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা মানুষ ও সমাজকে সার্বিকভাবে উন্নত ও সুখী করে না, বরং সবাইকে একটা সংকটের দিকে, এক গভীর সংকটের অভিমুখে চালিত করে। সমাজ ও সারা বিশ্বে অস্থিরতা বাড়ে। এক আত্মসর্বস্ব ভোগবাদী জড়মুখী সংস্কৃতি তৈরি করে, যা বিশ্বের ভবিষ্যত অস্তিত্বের পক্ষেও বিপদজনক।

দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে এবং অন্যান্য সামাজিক ও পরিবেশগত উদ্দেশ্যগুলি অগ্রাহ্য করে আমরা পরিমাণগত বিস্তারের দিকে নজর দিয়েছি। শিক্ষার ব্যাপক ও সুউচ্চ উদ্দেশ্য ও সদর্থক জ্ঞান ব্যাহত হওয়ায় উচ্চশিক্ষা সহ সমগ্র স্তরের শিক্ষার গুণগত মান নিম্নমুখী, বাইরের জৌলুষ বাড়ছে সত্য, কিন্তু অন্তরের ঐশ্বর্য ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। মানবিক ক্ষুধা নিরসন হয় না ও মূল্যবোধ হয় অতল তলে নিক্ষিপ্ত।

উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত তত্ত্বগত ও বাস্তব প্রেক্ষাপটে আমরা প্রবন্ধটির পরবর্তী অংশে পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের উচ্চশিক্ষার সাম্প্রতিক বিস্তার ও তার ফলাফল বিশদভাবে আলোচনা করব, যদিও তা যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত পরিসরে।

উচ্চশিক্ষার পরিমাণগত অগ্রগতি ঃ

ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি, স্বাধীন ভারতে উচ্চশিক্ষার বিস্তার খুবই উল্লেখযোগ্য। ১৯৫১ খ্রি. পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হওয়ার সময় থেকে এই পরিকল্পনায় সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর। তা করতে গিয়ে প্রথম দু'এক দশক মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা বিস্তারের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় এই কারণে যে, এই শিক্ষা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলির বিকাশে যে সুদক্ষ শ্রমিক দরকার তা পর্যাপ্ত পরিমাণে যোগান দেবে। পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক সংস্কার (Economic reforms) গ্রহণ করার ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব ক্রমাগত বেড়েছে। ফলস্বরূপ, মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার বিস্তারও প্রয়োজনীয় গুরুত্ব পেয়েছে। মনে রাখা দরকার, উচ্চশিক্ষার বিস্তার দ্রুত করতে গেলে মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তারও দ্রুত করা হয়, কেননা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষার্থীরা আসে মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে। তাই আমরা লক্ষ্য করি, মৌলিক শিক্ষার বিস্তারে ২০০১ খ্রি. থেকে সর্বশিক্ষা অভিযান শুরু হয়েছে। ২০০৯ খ্রি. শিশুদের জন্য বিনা বেতনে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন চালু হয়েছে। ঐ খ্রিস্টাব্দ থেকে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান এবং অতি সাম্প্রকি সময়ে রাষ্ট্রীয় উচ্চশিক্ষা অভিযান শুরু হয়েছে। এই সমস্ত প্রকল্পের রূপায়ণে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে ভৌত পরিকাঠামোগত বিকাশ, যা অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের যুগে শ্রেষ্ঠ চালিকাশক্তি হিসাবে পরিগণিত

Scanned with CamScanner

হচ্ছে। শিক্ষক-অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মী প্রয়োজনীয় সহায়ক শক্তি হলেও আপেক্ষিকভাবে তা কম গুরুত্ব পেয়েছে। ফলে যে হারে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা উচ্চশিক্ষাস্তরে বেড়েছে উল্লিখিত মানবীয় শক্তির ব্যবহার সে হারে বাড়েনি। নিম্নলিখিত সারণিতে মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষকের সংখ্যা ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা দেখানো হল, যা উল্লিখিত বিষয়টি তথ্যসহ তুলে ধরছে।

সারণি-১

সমগ্র ভারতে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী সংখ্যা, ১৯৫১-২০১২

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১২	২০১৪	বার্ষিক বৃদ্ধির হার(%)
বিশ্ববিদ্যালয়	২৮	৪৫	৯৩	১২৩	১৭৭	২৬৬	৫৭৪	৭১২	৩৮.৮
মহাবিদ্যালয়	৫৭৮	১৮১৬	৩২২৭	৪৭৩৮	৭৩৪৬	১১১৪৬	৩৫৫৩৯	৩৬৬৭১	৯৯.১
শিক্ষক(০০০)	২৪	৬২	১৯০	২৪৪	২৭২	৩৯৫	৯৩৩	NA	৬২.১
শিক্ষার্থী(০০০)	১৭৪	৫৫৭	১৯৫৬	২৭৫২	৪৯২৫	৮৩৯৯	২২৩৭৩	NA	২০৯.১

N.A.—Not available.

উল্লিখিত সারণি থেকে এটা স্পষ্ট যে, ১৯৫১ থেকে ২০১৪ খ্রি. পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে বার্ষিক ৩৮.৮ শতাংশ হারে। মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯৯.১ শতাংশ হারে, ২০১২ খ্রি. পর্যন্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০৯.১ শতাংশ হারে বেড়েছে কিন্তু শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধির হার আপেক্ষিকভাবে কম, ৬২.১ শতাংশ হারে।

চরম (Absolute) সংখ্যাগত বিচারে উচ্চশিক্ষার বিস্তার বিস্ময়জনক মনে হলেও এটা স্বীকার করতেই হবে যে, আপেক্ষিক বিচারে উচ্চশিক্ষার বর্তমান অবস্থা (Status) সুখকর নয়। এখানে বিচার্য বিষয় হল, উচ্চশিক্ষার উপযুক্ত বয়স (১৮-২৩)-এর জনসংখ্যার মধ্যে কত শতাংশ মানুষ উচ্চশিক্ষা স্তরে ভর্তি হয়? ভারত সরকারের মানবসম্পদ বিকাশ দপ্তর প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, ২০১৪-১৫ খ্রি. সমগ্র ভারতে ২৩.৬ শতাংশ এই বয়সের যুবক-যুবতী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছে—যুবক ২৪.৫ শতাংশ, যুবতী ২২.৭ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে এই বিষয়ের চিত্র অনেক নিম্নমানের—যথাক্রমে ১৭.১ শতাংশ, ১৮.৮ শতাংশ এবং ১৫.৫ শতাংশ। এ বিষয়ে লিঙ্গ বৈষম্য সামান্য হলেও তা বিদ্যমান। লিঙ্গ বৈষম্য ক্রমহ্রাসমান হলেও তা যে দূর করা যায়নি, তার প্রমাণ মেলে ভারত সরকারের উচ্চশিক্ষার উপর প্রকাশিত সমীক্ষা প্রতিবেদন থেকে। এটা লক্ষ্য করা যায় যে, পশ্চিমঙ্গ সহ সমগ্র ভারতে তপশীল জাতি ও তপশীল উপজাতিদের মধ্যে লিঙ্গবৈষম্য যা লিঙ্গ সমতা সূচকের মধ্যে ধরা পড়ে তা চোখে পড়ার মতো। (সারণি-২ দেখুন)

সারণি-২ঃ লিঙ্গ সমতা সূচক (১৮-২৩ বছর)

	শিক্ষার্থী (২০১২)			শিক্ষার্থী (২০১৪)		
	সকল শ্রেণি	তপশীল	তপশীল উপজাতি	সকল শ্রেণি	তপশীল	তপশীল উপজাতি
পশ্চিমবঙ্গ	০.৭৩	০.৭১	০.৬৪	০.৮৩	০.৭৯	০.৭৩
সমগ্র ভারত	০.৮৮	০.৮৮	০.৭৪	০.৯৩	০.৯১	০.৮২

Scanned with CamScanner

অন্যদিকে উক্ত বয়সের তপশীল জাতি যুবক-যুবতীদের মোট ভর্তির শতাংশ হল সমগ্র ভারতে ১৮.৫ শতাংশ, যেখানে পশ্চিমবঙ্গে এর হার ১২.৯ শতাংশ। তপশীল উপজাতিভুক্ত যুবক-যুবতীদের মধ্যে এই হার আরো নিম্নমানে—সমগ্র ভারতে ১৩.৩ শতাংশ, যেখানে পশ্চিমবঙ্গে ৯.৭ শতাংশ। (সারণি-৩ দেখুন)

সারণি-৩

মোট ভর্তির অনুপাত (১৮-২৩ বছর), সমগ্র ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ, ২০১৪-১৫

	সকল শ্রেণি			তপশীল			তপশীল উপজাতি		
	যুবক	যুবতী	মোট	যুবক	যুবতী	মোট	যুবক	যুবতী	মোট
পশ্চিমবঙ্গ	১৮.৮	১৫.৫	১৭.১	১৪.৪	১১.৪	১২.৯	১১.৩	৮.২	৯.৭
সমগ্র ভারত	২৪.৫	২২.৭	২৩.৬	১৯.৩	১৭.৬	১৮.৫	১৪.৬	১২.০	১৩.৩

উৎস ঃ ভারত সরকারের মানবসম্পদ বিকাশ বিভাগ।

ভারত সরকারের জাতীয় নমুনা সমীক্ষা ২০১৪ খ্রি. উল্লিখিত বিষয়ে যে তথ্য তুলে ধরে তা আরো হতাশাব্যঞ্জক। এই সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতের গ্রাম ও শহরাঞ্চলে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট যোগদানের শতাংশ হল মাত্র ১৩। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে এর হার হল মাত্র ১০ শতাংশ। নীট যোগদানের শতাংশ সমগ্র ভারতে আরো কম। মাত্র ১২ শতাংশ। যেখানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে মাত্র ১০ শতাংশ। (সারণি-৪ দেখুন)

সারণি-৪

মোট ও নীট ভর্তির অনুপাত (১৮-২৩ বছর), সমগ্র ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ, ২০১৪-১৫

	মোট যোগদানের শতাংশ		নীট যোগদানের শতাংশ	
	২০০৭-৮	২০১৪	২০০৭-৮	২০১৪
পশ্চিমবঙ্গ	১০	১০	৯	১০
সমগ্র ভারত	১৩	১৩	১২	১২

উৎস ঃ জাতীয় নমুনা সমীক্ষা, ভারত সরকার।

উচ্চশিক্ষায় উল্লিখিত নিচুমানের যোগদান বিষয়টির পিছনে যে কারণ বা উপাদান প্রভাবশালী তা হল—মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে উপযুক্ত বয়সের কিশোর-কিশোরীদের ভর্তির অনুপাত উল্লেখযোগ্য নয়। সর্বশিক্ষা মিশন এবং রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা মিশন শুরু হলেও লক্ষ্য করা যায় যে, ২০১৪ খ্রি. সমগ্র ভারতে মাত্র ৬৪ শতাংশ কিশোর-কিশোরীদের উচ্চমাধ্যমিক স্তরে যোগদান করতে দেখা যায়। যেখানে পশ্চিমবঙ্গে এই হার ৫৬ শতাংশ। নীট যোগদানের শতাংশ সমগ্র ভারতে ৩৮ শতাংশ। যেখানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ২৮ শতাংশ। (সারণি-৫ দেখুন)

সারণি-৫

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে

	মোট যোগদানের শতাংশ		নীট যোগদান শতাংশ	
	২০০৭-৮	২০১৪	২০০৭-৮	২০১৪
পশ্চিমবঙ্গ	৩২	৫৬	১৭	২৮
সমগ্র ভারত	৪৮	৬৪	২৭	৩৮

উৎস ঃ ভারত সরকারের জাতীয় নমুনা সমীক্ষা।

Scanned with CamScanner

উল্লিখিত তথ্য উৎস অনুযায়ী ২০১৪ খ্রি. উচ্চশিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রী অনুপাত ১.০০-এর নিচে রয়েছে, যদিও 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেণ্ট গোল' (Millenium Development Goal) ঃ MDG অনুযায়ী এই অনুপাত ১.০০ হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক বিস্তারের পরেও দেখা যাচ্ছে, সমগ্র ভারতে নারী সাক্ষরতার হার ২০১৪ খ্রি. সমগ্র ভারতে ৬২.৩ শতাংশ যেখানে পুরুষ সাক্ষরতার হার ৮০.৫ শতাংশ। অর্থাৎ লিঙ্গ বৈষম্যের পরিমাণ হলো ১৮.৩ শতাংশ। সামগ্রিকভাবে সাক্ষরতার হার ৭১.৭ শতাংশ। MDG অনুযায়ী ১৫-২৪ বছর পর্যন্ত মানুষের সাক্ষরতার হার হবে ১০০ শতাংশ, যে লক্ষ্য এতটা শিক্ষাবিস্তারের পর এখনও সমগ্র ভারত পূরণ করতে পারেনি।

এটা অবশ্য উল্লেখযোগ্য যে, স্বাধীনতা উত্তরকালে ভারত সরকার সর্বস্তরের শিক্ষাবিস্তারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। যা পরাধীন ভারতবর্ষে লক্ষ্য করা যায়নি। শিক্ষাবিস্তারে সরকারি ব্যয়-বরাদ্দ বেড়েছে গত কয়েক দশকে বিশাল পরিমাণে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৫১-৫৬) যেখানে মাত্র ১৪ কোটি টাকা উচ্চশিক্ষায় ব্যয় করা হয়েছিল সেখানে নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) ২,৫০০ কোটি টাকা উচ্চশিক্ষার খাতে ব্যয় করা হয়েছে। ২০১০-১১ খ্রি. সমগ্র ভারতে রাজস্ব খাতে বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষায় মোট ৬২,৬৫৪.১৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। যা ভারতের মোট জাতীয় আয়ের ০.৮৬ শতাংশ। ঐ বছর মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লিখিত ব্যয় হয়েছিল ৭১,৩৫৮.৩৬ কোটি টাকা (ভারতের মোট জাতীয় আয়ের ০.৯৮ শতাংশ)।

উল্লিখিত সরকারি ব্যয় ছাড়াও রয়েছে শিক্ষাখাতে ব্যক্তিগত গার্হস্থ (Household) ব্যয়। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা ২০১৪ খ্রি. অনুযায়ী উচ্চস্তরের সাধারণ শিক্ষায় (General Education) শিক্ষার্থী পিছু বাৎসরিক গড় ব্যয় হয় স্নাতকস্তরে বছরে ১৩,৪০১ টাকা, স্নাতকোত্তর স্তরে ঐ ব্যয় ১৫,৯৯৯ টাকা। ডিপ্লোমা স্তরে ১৫,৯১৭ টাকা। অন্যদিকে কারিগরি অথবা বৃত্তিমূলক শিক্ষায় মাথাপিছু বাৎসরিক ব্যয় হয় অনেক বেশি। যেমন, চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষায় সরকারি প্রতিষ্ঠান স্তরে ৬৪,৯৬৮ টাকা, ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষায় সরকারি প্রতিষ্ঠানে ব্যয় ৪২,৪০১ টাকা এবং ব্যবস্থাপনা বিদ্যায় ৪৪,৫১৯ টাকা। এই সমস্ত ব্যক্তিগত ব্যয়ের মধ্যে থাকে কোর্স ফী, পুস্তক ইত্যাদি, পরিবহন ব্যয়, ব্যক্তিগত কোচিং এবং অন্যান্য ব্যয়।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে, উচ্চশিক্ষা সরকার তথা ব্যক্তিগত পরিবারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ব্যয়বহুল। বিশেষ করে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে। স্বাভাবিকভাবে এই ব্যয়ের অঙ্ক অনেকটাই প্রভাবিত করে উচ্চশিক্ষার বিস্তার। ভারতের মতো স্বল্পোন্নত দেশে উচ্চশিক্ষায় ভর্তি ও যোগদানের অনুপাত আপেক্ষিকভাবে কম হওয়ার পিছনে এই আর্থিক দিকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়ে থাকে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, উচ্চশিক্ষার পাঠ্যক্রম। এটা উল্লেখযোগ্য যে, বিশ্বায়নের সুবাদে ভারতে উচ্চশিক্ষার বিষয়গুলির মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্য এসেছে। যাতে শিক্ষার্থীগণ

Scanned with CamScanner

তাদের সামর্থ্য ও প্রবণতা অনুযায়ী যে কোন বিশিষ্ট বিষয়ে তাদের পাঠ চালিয়ে যেতে পারে। তবে এটাও সত্য যে, এই পাঠ্যক্রম সর্বত্র প্রায় একই ধরণের এবং তা রচিত হয়েছে বিশ্বয়নের যুগে আরো আধুনিকীকরণ ও পরবর্তী স্তরের শিক্ষার দিকে তাকিয়ে। ভারতের মতো উন্নতিশীল দেশের বৈচিত্র্যপূর্ণ আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে এই ধরণের Uniform পাঠ্যক্রম কতটা সাযুজ্যপূর্ণ বা প্রাসঙ্গিক সেদিক বিবেচনা না করে। অথচ উচ্চশিক্ষাকে আমরা বলছি 'সেবামূলক' শিক্ষা। এখানে তত্ত্বগতভাবে সেবামূলক কাজ বলতে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কাজকে বা সেবাদানকে বোঝানো হচ্ছে। বস্তুতঃ, উচ্চশিক্ষার পাঠ্যক্রম ও বাস্তব প্রয়োজন সমমুখী না হলে এই শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ বিষয়ে প্রশ্ন অথবা সমস্যা রয়ে যায়। বস্তুতঃ বিশাল সরকারি ও বেসরকারি ব্যয়ে উচ্চশিক্ষার উল্লেখযোগ্য বিস্তার যে একই আদলে সাম্প্রতিক সময়ে ঘটছে তা দীর্ঘদিন সাবলীলভাবে চালিয়ে যাওয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। এই প্রাসঙ্গিক বিষয়টি পরবর্তী অংশে আমরা আরো আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

উচ্চশিক্ষার কিছু সমস্যা ঃ

উচ্চশিক্ষা বিস্তারের মধ্য দিয়ে যেমন কিছু সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়, তেমনি ঐ বিস্তারের সঙ্গে বেশকিছু সমস্যাও ধীরে ধীরে জেগে ওঠে। ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নে উচ্চশিক্ষার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিগত দু'একটি দশকে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে সেবামূলক ক্ষেত্র অগ্রগণ্য ক্ষেত্র হিসাবে পরিণত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে উচ্চশিক্ষা সহ অন্যান্য স্তরের শিক্ষার উপর বিশিষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই উচ্চশিক্ষার বিস্তার জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে, তার বণ্টনে ও নিয়োগ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে।

অবশ্য এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার যে, উচ্চশিক্ষা সহ সমস্ত স্তরের শিক্ষার একটি বৃহত্তর সামাজিক তাৎপর্য রয়েছে। এই তাৎপর্য পাঠ করা যাবে যখন আমরা উচ্চশিক্ষার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত অবদানের দিকে তাকাব। ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, উচ্চশিক্ষার পাঠ্যক্রম রচনায় এই সামাজিক ইত্যাদি দিকগুলি যথেষ্ট পরিমাণে অবহেলিত। এর ফলে বিভিন্ন ধরণের সমস্যা উচ্চশিক্ষাকে কেন্দ্র করে দেখা যাচ্ছে, যা সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

ক. উদ্দেশ্যগত সংকীর্ণতা ঃ

ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, উচ্চশিক্ষার পাঠক্রম আধুনিকীকরণ করতে গিয়ে আমরা যতটা বিশ্বায়নের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছি ততটা দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত প্রয়োজনের দিকটি লক্ষ্য রেখে নয়। ফলে বৃহত্তর সমাজ থেকে আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষা যথেষ্টই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এর ফলে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত যুবক-যুবতী শিক্ষা সমাপনান্তে কি করবে সেটাই সমস্যা। পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের উচ্চশিক্ষায় সাধারণ শিক্ষার উপর গুরুত্ব সর্বাধিক। উদাহরণ স্বরূপ ১৫-২৯ বছর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের

Scanned with CamScanner

৮৫ শতাংশই সাধারণ শিক্ষা নেয়। অন্যদিকে ১৫ শতাংশ নেয় কারিগরি অথবা পেশাগত শিক্ষা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে এই চিত্রটি আরো অধিক একপেশে। এখানে ৯১ শতাংশের বেশি শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষা নেয়। অন্যদিকে কারিগরি ও বৃত্তিগত শিক্ষা পায় মাত্র ৯ শতাংশেরও কম। এভাবে আমরা দেখতে পাই, মাধ্যমিক শিক্ষাসহ উচ্চশিক্ষায় বৈচিত্র্য এলেও তা যথেষ্ট বৈচিত্র্যসূচক নয়।

খ. বাহ্যিক সুবিধা ঃ

শিক্ষা বিস্তারের অন্যতম যৌক্তিকতা হল, শিক্ষা বাহ্যিক সুবিধার সৃষ্টি করে। বিভিন্ন গবেষণায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রাথমিক শিক্ষাসহ প্রারম্ভিক বা মৌলিক শিক্ষার বাহ্যিক সুবিধা প্রচুর। অর্থাৎ এখানে লক্ষ্য করা যায় যে, এই স্তরের শিক্ষিত মানুষেরা পাশাপাশি অন্যদেরও শিক্ষায় উৎসাহিত করে। কিন্তু প্রশ্ন হল, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এইরূপ বাহ্যিক সুবিধা দেখা যায় কি?

বর্তমান ভারতের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এই প্রশ্নটির উত্তর খুঁজলে দেখা যাবে যে, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি ক্বচিৎ এই ধরণের বাহ্যিক সুবিধা সৃষ্টি করে থাকেন। ভিন্নভাবে বললে এটা দাঁড়ায় যে, উচ্চশিক্ষায় ব্যক্তিগত লাভ বা সুবিধাই প্রবল। সামাজিক প্রতিদান নেই বললেই চলে। এর পিছনে কারণ হল, উচ্চশিক্ষার পাঠক্রমে এই সামাজিক দিকটি, বিশেষতঃ নীতিনৈতিকতার (Ethics) দিকটি প্রায় অনুপস্থিত (সাম্প্রতিক সময়ে বিদ্যালয় শিক্ষায়ও এটা দেখা যাচ্ছে)। ফলে উচ্চশিক্ষা ব্যক্তিগত সম্পদ বা মূলধন সৃষ্টি করে, কিন্তু সামাজিক মূলধন সৃষ্টি প্রায় হয় না। এইভাবেই সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে উচ্চশিক্ষার কদর বা গুরুত্ব খুবই কমে আসে। অনেকক্ষেত্রেই মনে হয়, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ যেন ভিন্ন এক দ্বীপের বাসিন্দা অথবা ভিন্ন জগতের জীব। সমাজের বাকি অংশ (যা সমাজের বৃহত্তম অংশ) যেন আর এক ভিন্ন জগতের মানুষ। এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি স্বাভাবিকভাবেই কঠিন সমস্যার জন্ম দেয়।

গ. শিক্ষিত বেকারের সমস্যা ঃ

ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, অর্থনৈতিক প্রয়োজনে নব্য উদারীকরণ যুগে উচ্চশিক্ষার বিস্তার। যদি এটাই বাস্তবে ঘটে থাকে তবে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলির বিকাশের উপর নির্ভর করবে। যদি অর্থনৈতিক বিকাশের হার ত্বরান্বিত হয়, তাহলে এই ধরণের শিক্ষিত যুবক-যুবতীর নিয়োগগত চাহিদা বাড়বে। অন্যথায় চাহিদা যোগানের ভারসাম্যহীনতা শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের সমস্যার মুখে ঠেলে দেবে। যেহেতু ভারতের অর্থনীতি মাথাপিছু আয়ের বিচারে সমগ্র বিশ্বের প্রেক্ষাপটে মধ্যমানের এবং ভারত একটি জনবহুল দেশ, সেইহেতু উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের শতাংশ নিম্নমানের হলেও সংখ্যার বিচারে তা বিশাল। যেহেতু আবার অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার দ্রুত করতে গিয়ে আমরা মূলধন ও প্রযুক্তিনিবিড় উৎপাদন প্রক্রিয়া গ্রহণ করে থাকি তার ফলে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত (সাধারণ ও কারিগরি

Scanned with CamScanner

উভয় শাখায়) মানুষের অর্থনৈতিক প্রয়োজনে চাহিদা বিশাল হয় না। ফলস্বরূপ বেকার সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে।

বিভিন্ন গবেষণা প্রবন্ধে ও প্রতিবেদনে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত মানুষদের মধ্যে বেকারত্বের হার অনেক কম। অন্যদিকে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর, ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারী শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে বেকারত্বের হার আপেক্ষিকভাবে অনেক বেশি। এমন কি কারিগরি ও বৃত্তিগত শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক-যুবতীও কর্মসংস্থান করতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যায়। বস্তুতঃপক্ষে বর্তমান অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন অর্থনৈতিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে মানবীয় সম্পদ ও মূলধনের যোগান দ্রুত বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং অনুমান করেছে যে, ঐ ধরণের যোগানগত বিস্তার আপনা থেকেই চাহিদার সৃষ্টি করবে, যা অর্থনীতি শাস্ত্রে Say's Law হিসাবে খ্যাত। কিন্তু এই তত্ত্ব ভারতের মতো অর্থনৈতিক ও সামাজিক শ্রেণিবিভক্ত সমাজে যে কাজ করে না, তা প্রমাণিত সত্য। তাহলেও অর্থনীতির বিকাশের ক্ষেত্রে সাপ্লাই সাইড অর্থনীতি (Supply Side Economics)-র উপর আমরা গুরুত্ব আরোপ করে চলেছি, এর চাহিদার দিকটি বিকশিত না করেই। এর ফলে নিয়োগের বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়ছে। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত যুবক-যুবতী কর্মসংস্থানের প্রয়োজনে ভীষণভাবে কম মজুরিতেও কাজ করতে এগিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছেন, কেবলমাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজনে। এই প্রক্রিয়ায় যাদের লাভ হচ্ছে তারা হল—আপেক্ষিকভাবে বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী ও ব্যবসায়ী। যেটা কথায় বলে, কারো পৌষ মাস আর কারোর সর্বনাশ।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে এই বেকার সমস্যার দিকটি এখানে তুলে ধরা যেতে পারে। (সারণি-৬ দেখুন)

সারণি-৬

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের গ্রাম ও শহরাঞ্চলে শিক্ষাগত মানের প্রেক্ষাপটে বেকারত্বের হার (শতাংশে), ১৯৯৯-২০০০ থেকে ২০১১-১২

শিক্ষাগত মান	গ্রাম				শহর			
	১৯৯৯-০০	২০০৪-০৫	২০০৯-১০	২০১১-১২	১৯৯৯-০০	২০০৪-০৫	২০০৯-১০	২০১১-১২
স্বাক্ষর নয়	১.০	০.৬	০.১	০.৪	২.৪	০.৩	০.২	০.৬
প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত	২.৭	০.৮	০.৫	১.৭	৫.৩	১.৪	০.৫	১.৭
মধ্যমান	৪.৮	১.৬	১.৯	১.৩	১১.৫	৩.৮	২.৪	২.৩
মাধ্যমিক	১১.৮	৫.৭	৩.৪	২.৮	৯.৩	৫.২	২.২	১.৫
উচ্চ-মাধ্যমিক	১২.৬	৭.৪	৬.১	৫.৫	১২.৫	৫.২	৩.৫	২.৩
স্নাতক	২০.৫	১১.২	৬.৩	১০.৬	১৩.১	৫.৯	৪.৬	৫.৯
স্নাতকোত্তর	NA	১৫.৫	৯.৬	৯.০	NA	৫.৭	৫.৩	৭.৪
ডিপ্লোমা	NA	০.৭	৩.২	০.০	NA	৮.৮	২.৫	১.২
সমগ্র	৩.৭	১.৩	১.০	১.৬	৮.৫	২.৯	২.৮	২.৩

• NA—Not Applicable, তথ্যসূত্র—NSS ২০১১-১২।

Scanned with CamScanner

উল্লিখিত সারণি থেকে এটা পরিষ্কার যে, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে শিক্ষিত মানুষের মধ্যে বেকারত্বের হার অন্যান্য স্তর অপেক্ষা অনেক বেশি। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে ১০ শতাংশেরও বেশি স্নাতকস্তরের শিক্ষিত বেকার। অন্যদিকে স্নাতকোত্তর স্তরে ৯ শাতাংশ। শহরাঞ্চলে এই হার যথাক্রমে ৫.৯ এবং ৭.৪ শতাংশ। অবশ্য শিল্প ও বাণিজ্যমহল শিক্ষিত বেকারের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে অনেক সময় বলে থাকেন যে, শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের অনেকেই নিয়োগযোগ্য নয়। কেননা, তাদের মধ্যে বিষয়গত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিম্নমানের। আসলে শিল্প ও বাণিজ্যমহলের চাহিদার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রম রচিত হয় না অথবা শিল্প-কারখানা ও বাণিজ্যক্ষেত্রে সরাসরি যোগাযোগ অনেক শিক্ষিত মানুষের থাকে না। এর ফলে উল্লিখিত মহলের চাহিদার ধরণ এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষিত মানুষের শিক্ষার ধরণ উভয়ের মধ্যে সাযুজ্য পূর্ণমানের হয় না।

অন্যদিকে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের এক বিশাল অংশ বিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ খোঁজে কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা অনুপাতে শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ায় এ ধরণের মানুষদের মধ্যে নিয়োগের সমস্যা গভীর হতে থাকে।

তাছাড়া এটা প্রতীয়মান যে, সমগ্র ভারতে যে ধরণের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে, সেখানে অধিকাংশ শিক্ষিত যুবক-যুবতী নিজেদের উপযুক্তভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না। ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, উচ্চশিক্ষারও উদ্দেশ্য সংকীর্ণ—বর্তমান স্তর থেকে পরবর্তী স্তরে উত্তরণই এই শিক্ষার লক্ষ্য। বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করা সেখানে গৌণ হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলিতে যে ব্যাপক জ্ঞানের প্রয়োজন তা উচ্চশিক্ষার বিশিষ্ট জ্ঞান দিয়ে উঁচুমানে চালানো যায় না। ফলে এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলির জ্ঞানগত চাহিদা ও শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের জ্ঞানগত আহরণ—উভয়ের মধ্যে একটা ব্যবধান বা ঘাটতি নজরে পড়ে। এর ফলে সংকট বাড়ে বৈ কমে না।

ঘ. ভাষা শিক্ষায় গুরুত্বের অভাব ঃ

ভাষা হল শিক্ষা তথা আত্মপ্রকাশের মাধ্যম। শিক্ষার আধুনিকীকরণ করতে গিয়ে ভাষাশিক্ষার উপর গুরুত্ব আপেক্ষিকভাবে কমানো হয়েছে। মাধ্যমিক তথা উচ্চশিক্ষার স্তরে এমন কি মৌলিক স্তরেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, কথা বলার দক্ষতার উপর। পাঠ ও লিখন দক্ষতার উপর গুরুত্ব কমেছে অনেকটাই। ফলে ভাষাশিক্ষার ভিত শিশু, কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীদের মধ্যে যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং এই দুর্বল ভাষাজ্ঞান নিয়ে শিক্ষার প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পরীক্ষার্থী ভালো ফললাভ করতে পারে না।

ঙ. প্রতিকূল শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত ঃ

ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, শিক্ষক নিয়োগ ছাত্রছাত্রী অনুপাতে না হওয়ায় শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে প্রতিকূল শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত লক্ষ্য করা যায়। কাম্যতম অনুপাত

Scanned with CamScanner

অপেক্ষা বেশি হলে শিক্ষক যত্নবান হলেও যথার্থ জ্ঞান শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চারণ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে জ্ঞানগত ঘাটতিতে শিক্ষার্থীরা ভুগতে থাকে।

নিম্নের ২টি সারণিতে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত তুলে ধরা হল। এর মধ্য দিয়ে এক প্রতিকূল চিত্র লক্ষ্য করা যাবে।

সারণি-৭ (ক)

উচ্চশিক্ষা স্তরে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত, ২০১৪-১৫

	সকল প্রতিষ্ঠান		মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়
	নিয়মিত ও দূরশিক্ষা	নিয়মিত	নিয়মিত ও দূরশিক্ষা
পশ্চিমবঙ্গ	৩৮	৩৪	৪০
সমগ্র ভারত	২৩	২১	২৪

উৎস ঃ ভারত সরকার।

সারণি-৭ (খ)

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত, ২০১১-১২

	ইন্টারমিডিয়েট ও মাধ্যমিক	উচ্চমাধ্যমিক
পশ্চিমবঙ্গ	৫৩	১১৩
সমগ্র ভারত	৩৩	৩২

উৎস ঃ ভারত সরকার।

সারণি-৬ (ক) থেকে দেখা যায় যে, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত সমগ্র ভারতে ২০-র উপরে। পশ্চিমবঙ্গে এই অনুপাত আরো বেশি (৩০-এর বেশি) এবং প্রতিকূল। সারণি-৬ (খ)-তে লক্ষ্য করা যায় যে, সমগ্র ভারতে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত ৩০-এর উপরে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই অনুপাত আরো বেশি (৫০-এর বেশি) এবং প্রতিকূল। এটা সহজেই উপলব্ধিযোগ্য যে, এই প্রতিকূল শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত শিক্ষাগত মানের উন্নয়নের পক্ষে প্রতিবন্ধক।

তাছাড়া, ঘন ঘন শিক্ষাদান পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটায় শিক্ষকেরা বিপাকে পড়েন। কেননা যে শিক্ষাদান পদ্ধতিতে তারা দক্ষ হয়ে উঠছেন সেই পদ্ধতি ত্যাগ করে তাকে নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এমনভাবে যে, নতুন পদ্ধতি আত্মীকরণ ও তার প্রয়োগ—উভয়ের মধ্যে ব্যবধান রচিত হয়। ফলে শিক্ষাদান কার্য সুষ্ঠুভাবে চালানো যায় না। একটা ঘাটতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে চলতে থাকে এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ঘাটতি ক্রমাগত বাড়তেও থাকে। শিক্ষাক্ষেত্রে এক সঙ্কট নেমে আসে।

চ. শিক্ষার্থীদের জ্ঞানগত ঘাটতি ঃ

আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির যুগে পরীক্ষা ব্যবস্থায় তথ্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব পড়েছে। প্রশ্নপত্রের ধরণ এমনভাবে বদলানো হয়েছে যে, পরীক্ষার্থী কত মাত্রায় তথ্য মাথায় রাখতে পেরেছে তার নম্বর ক্ষেত্রে সেটি সবচেয়ে বড় নির্ণায়ক। এভাবে তথ্যগত শক্তি বাড়ে সত্য কিন্তু এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর আসল জ্ঞানসঞ্চার হয় বলা যাবে না। কেননা, জ্ঞান হল এমন এক শক্তি যার উদ্ভব বা সঞ্চার ঘটে বিভিন্ন তথ্য ও ধ্যানধারণা তার মস্তিষ্কে ক্রিয়া করার মধ্য দিয়ে। যখন শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মীকরণ (Assimilation)

Scanned with CamScanner

হয় তখনই তার জ্ঞানসঞ্চার ঘটে। দুর্ভাগ্য হল, অনেকক্ষেত্রেই তথ্যকে জ্ঞান হিসাবে চালিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ হচ্ছে ও তার প্রমাণ মিলছে। আসলে শিক্ষার্থীকে আমরা তখনই প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত বলব, যখন তথ্য ও তত্ত্বের সংমিশ্রণে অথবা মিথস্ক্রিয়ায় তার মধ্যে জ্ঞানসঞ্চার ঘটে। তথ্যের পাহাড় শিক্ষার্থীর মধ্যে গড়ে উঠলেই তাকে জ্ঞানী বলা যাবে না। রোবট জ্ঞানী নয়। জ্ঞানসঞ্চার না ঘটলে শিক্ষার্থী তার যথার্থ প্রয়োগ করতে পারে না। শিক্ষাক্ষেত্রে তথা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতেও এইভাবেই জ্ঞানের ঘাটতি শিক্ষার্থীর নিয়োগযোগ্যতা কমিয়ে দেয়। তার মধ্যে এক নৈরাশ্য কাজ করে ও ঘনীভূত হয়—যা সত্যি বিপজ্জনক।

সিদ্ধান্ত ঃ

স্বাধীনতা উত্তরকালে উচ্চশিক্ষার পরিমাণগত অগ্রগতি ও বৈচিত্র্য সন্তোষজনক হলেও ভারতের মত অর্থনৈতিক ও সামাজিক শ্রেণিবিভক্ত সমাজে লিঙ্গ ও শ্রেণিগত বৈষম্য দূর করা যায়নি। উচ্চশিক্ষাসহ সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থারই এখন মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য—জীবিকা অর্জনের জন্য শিক্ষা। জ্ঞানার্জন ও প্রজ্ঞাবান হওয়া এখন আর প্রধান উদ্দেশ্য নয়। শিক্ষার বিস্তার এইভাবে একমুখী করতে গিয়ে শিক্ষার চাহিদা ও যোগানের মধ্যে এক ভারসাম্যহীনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মানুষ যেমন তার দেহরক্ষার জন্য চাহিদা আছে তেমন তার একটি বড় মনও আছে, যার তৃপ্তি দরকার। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় ভৌত বিষয়ের উপর বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়ে মানুষের উচ্চতর বৃত্তিগুলি অতৃপ্ত রয়ে যাচ্ছে। যার ফলে আত্মকেন্দ্রিক উচ্চশিক্ষা সার্থক হয়ে উঠছে না। সমাজ-সংস্কৃতি ও পরিবেশকে উপেক্ষা করতে গিয়ে অর্থনৈতিক প্রয়োজনের ঘেরাটোপে আমরা শিক্ষাকে বন্দী করে ফেলেছি। তার যে বৈচিত্র্যময় উদ্দেশ্যমূলক ব্যাপক চাহিদা, সেদিকে আমরা ন্যূনতম গুরুত্ব আরোপ করি না। এর ফলে উচ্চশিক্ষার গুণগত দিকটি বিকশিত হচ্ছে না, বরং বহুবিধ সমস্যা ও সংকট দেখা যাচ্ছে। উচ্চশিক্ষার বাহ্যিক সুবিধা আছে বলে অনেকে মনে করেন না। আবার উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের মধ্যে বেকার সমস্যা অন্যদের অপেক্ষা প্রকট রূপ নিচ্ছে। পাঠ্যক্রমের সংস্কার হচ্ছে এমনভাবে, যাতে করে ভাষাশিক্ষায় গুরুত্ব কমে, তথ্য সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয়, জ্ঞানার্জনের লক্ষ্য গৌণ হয়ে যায়। শিক্ষার্থীরা যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে রোবটে পরিণত হয়। শিক্ষার ভৌত বিস্তারের উপর অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের যুগে বেশি গুরুত্ব পড়ে, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ আপেক্ষিকভাবে কম হয় এবং প্রতিকূল শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত চলতেই থাকে। উল্লিখিত বিষয়গুলি উচ্চশিক্ষার স্বাস্থ্যহীনতার দিকটি অঙ্গুলি সংকেত করে।

উচ্চশিক্ষার এই বিষম বিস্তারের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এর সদর্থক বিকাশের স্বার্থে পুনঃসংস্কার আশু প্রয়োজন। তা কোন্ পথে হবে, এটা এখন জরুরী প্রশ্ন। আমাদের বোধ হয়, নিম্নলিখিত কয়েকটি দিক গুরুত্ব পেলে আমরা আবার উচ্চশিক্ষাসহ সমস্ত শিক্ষাস্তরের সুস্বাস্থ্য অর্জন করতে পারব।

প্রথমতঃ, ভারতবর্ষের অতীত শিক্ষাগরিমার দিকটি আমাদের ফিরে দেখতে

Scanned with CamScanner

হবে। প্রাচীনযুগে নালন্দা, তক্ষশীলা ইত্যাদি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গরিমা এবং তার পিছনে যে যে বড় দিক ও শক্তিগুলি কাজ করেছিল, সেগুলি অনুধাবন করে বর্তমান উচ্চশিক্ষার ধারা আবার বদলাতে হবে। কোন দেশেই উচ্চশিক্ষাসহ অন্যান্য স্তরের শিক্ষা সমাজ, সংস্কৃতি ও পারিপার্শ্বিকতা নিরপেক্ষ হতে পারে না। নব্য-উদারীকরণের যুগে আত্মকেন্দ্রিক ও ভোগবাদী তত্ত্ব থেকে নিজেদের মুক্ত করে সমুন্নত ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে যদি আমরা শিক্ষা ব্যবস্থা বদলাতে পারি, তাহলে এই শিক্ষা কেবলমাত্র অর্থনৈতিক প্রয়োজনের ঘেরাটোপ থেকে নিজেদের মুক্ত করে ব্যাপক ও বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধনে নিমগ্ন হবে। এভাবে শিক্ষাগত অগ্রগতি ঘটলে যেমন শিক্ষার যোগান বাড়বে, তেমনি সমাজ, সংস্কৃতি এবং পরিবেশগত বৈচিত্র্যপূর্ণ চাহিদা মিটিয়ে শিক্ষাকে এক ভারসাম্যযুক্ত অবস্থায় উন্নীত করবে। এভাবে শিক্ষিত মানুষ আবার তার সমগ্র দিকটি সুস্থভাবে বিকশিত করতে পারবে। নৈরাশ্যের ঘন অন্ধকার থেকে মানুষের যাত্রা হবে আলোকের পথে।

দ্বিতীয়তঃ, অর্থের গুরুত্ব স্বীকার করেও আমাদের মনে রাখতে হবে, অর্থকে যেন আমরা সংকীর্ণ অর্থে আটকে না রাখি। অর্থ মানে যদি সম্পদ হয়, তাহলে বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাণময় ঐশ্বর্যও অর্থ। এইভাবে যদি আমরা ভৌতিক অর্থসহ মানসিক ঐশ্বর্যকে সুস্থ মেলবন্ধনে গড়ে তুলতে পারি, তাহলে তা সুন্দর ও অকৃত্রিম এবং প্রাণদ হয়ে উঠবে। সেখানে পারস্পরিক রেষারেষি, কোন্দল ও অসুস্থ প্রতিযোগিতা থাকবে না। মানুষ তার দুর্মূল্য জীবন কাটাবে সত্যিকার মানুষ হয়ে। এমন কি এভাবেই সাধনার গুণে মানুষ দেবত্বেও উন্নীত হতে পারবে। ভারতবর্ষ সহ বিশ্বের বড় বড় দার্শনিক, চিন্তাবিদ ও মহাপুরুষদের যে পথ, সেই পথই আমাদের পথ হলে আমরা সঠিক পথ পাব। 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ', অর্থাৎ মহাপুরুষগণ যে পথে গমন করেছেন, সেই পথই আসল পথ। উচ্চশিক্ষাসহ সমস্ত স্তরের শিক্ষাই এভাবে এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মধ্য দিয়ে অভীপ্সিত পথের সন্ধান মেলে। আলোকের পথে মানুষের যাত্রা হয়। মানুষ এভাবে আলোকময় ও বিভূতিবান হয়ে ওঠে। এটাই যথার্থ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

তৃতীয়তঃ, অর্থনৈতিক প্রয়োজনে ভৌত পরিকাঠামোগত বিস্তারের যতই গুরুত্ব থাকুক না কেন তা মানবীয় সত্তাকে কোনরকমেই লঘু বা হেয় করে নয়। কেননা আমাদের মনে রাখা দরকার, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। বিদ্বৎজনের এই সূক্তি আমাদের সামনের দিকে শিক্ষাক্ষেত্রের পথ নির্দেশ করবে। অবশ্য এই সত্য মেনে নেওয়ার মতো আমাদের চিত্তগত উৎকর্ষ লাভ করতে হবে।

চতুর্থতঃ, উচ্চশিক্ষাসহ সমস্ত শিক্ষার ভিত রচনা করে কেবলমাত্র প্রাণহীন ভৌত পরিকাঠামো (যেমন বিল্ডিং, ল্যাবোরেটরী, শিক্ষা-উপকরণ) নয়, শিক্ষার আসল বেদীভূমি রচিত হয় তার পাঠ্যক্রমের সাবলীলতা ও প্রাসঙ্গিকতার মধ্য দিয়ে। আমাদের মনে রাখতে হবে, অন্ধ অনুকরণের মধ্য দিয়ে কিছু সাজা যায় কিন্তু তা আসল রূপ নহে। সুতরাং, পাঠ্যক্রম হবে স্বাভাবিক। দেশের নিজস্ব সংস্কৃতি, প্রবহমান সমাজ ও পরিবেশের উপর ভিত্তি করেই শিক্ষার উপযুক্ত পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে—যাতে শিশু থেকে শুরু

Scanned with CamScanner

করে যুবক-যুবতী পর্যন্ত সবাই মনে করে, তারা যা চেয়েছিল তাই-ই তারা পাঠক্রমে উন্নতরূপে দেখতে পাচ্ছে। এভাবেই তাদের সুস্থ ও সাবলীল বিকাশ ঘটবে। তাদের কোনদিনই বলতে শোনা যাবে না—'যাহা আমি চাই ভুল করে চাই, যা পাই তাহা চাই না'। এভাবে উচ্চশিক্ষার স্তরে আমাদের পাঠক্রম যদি পুনঃসংস্কার করতে পারি তাহলে শিক্ষার্থীরা আবার উদ্বেলিত প্রাণ ফিরে পাবে।

পঞ্চমতঃ, শিক্ষার অর্থ ও উদ্দেশ্য, তথ্য চয়ন নয়। তথ্য প্রয়োজনীয় হলেও তাকে উপাদান হিসাবে নিয়ে সমস্ত ধ্যান-ধারণা ও তত্ত্ব তার সঙ্গে মিশিয়ে মানুষের দুর্মূল্য মস্তিষ্কে সবকিছু ক্রিয়াশীল করে যে জ্ঞানের উদ্ভব ঘটে (প্রকৃতি জগতে সালোকসংশ্লেষের মতো) সেই জ্ঞানার্জনই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সেই জ্ঞান বিকশিত হলে মানুষ তার উন্নত শিক্ষার আলোকে বাস্তবে উদ্ভূত বিবিধ সমস্যার সমাধান শিক্ষিত তথা আলোকপ্রাপ্ত মানুষই করতে পারবে, বাইরের কোন শক্তির দয়াদাক্ষিণ্যের উপর তাকে সমস্যা সমাধানে নির্ভরশীল হতে হবে না।

ষষ্ঠতঃ, উচ্চশিক্ষার পুনঃসংস্কারের কাঠামোতে ভাষাশিক্ষার উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এই ভাষাশিক্ষায় কেবলমাত্র কথপোকথনের দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এর পাশাপাশি যথোচিত গুরুত্ব পাবে পঠন দক্ষতা, লিখন দক্ষতা এবং বোধগত দক্ষতা। এভাবে যদি ভাষাশিক্ষায় মানুষ পরিপূর্ণ দক্ষ হয়ে ওঠে তবে বিশ্বের সমস্ত ধরণের ধ্যান-ধারণা, তত্ত্ব তার করায়ত্ত হবে। তার নিটোল জ্ঞান অর্জন এভাবে সম্ভব। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, এই ভাষাগত বিকাশ ঘটবে ব্যক্তির নিজস্ব ভাষাকে ভিত করেই, সহযোগী অন্য কোন ভাষা আসতে পারে তবে তা মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে নয়। আসলে সমাজ-সংস্কৃতি ও প্রকৃতি বৈচিত্র্যময়, এখানে বৈচিত্র্যময় দিকটি মাথায় রেখে এগোতে হবে। সমস্ত কিছু বৈচিত্র্যই উপেক্ষা করে একসুরে বেঁধে দেওয়া (Uniformity)-র চেষ্টা কোন যুগে, কোন দেশেই সফল হয়নি। ভারতের মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশেও এই ধরণের অপচেষ্টা থেকে বিরত থাকা যথার্থ কাজ ও পথ বলে বিবেচিত হবে।

সবশেষে বলি, মানুষ বৈচিত্র্যময়। তার সমাজ-সংস্কৃতি-প্রকৃতিও তদ্রুপ। উচ্চশিক্ষাসহ সমগ্র শিক্ষাক্ষেত্রে এই বৈচিত্র্য যত বেশি আনা যায় তত শুভ, ততই সর্বাঙ্গীন কল্যাণ। এই কল্যাণের পথই শিক্ষার পথ। তার লক্ষ্য হল, অর্থনৈতিক মঙ্গলসহ মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশ।

তথ্যঋণ ঃ

১। ভারত সরকার মানবসম্পদ বিকাশ দপ্তর, *বার্ষিক প্রতিবেদনের বিভিন্ন সংখ্যা।*

২। ভারত সরকারের *জাতীয় নমুনা সমীক্ষা*, ৬৪-তম ও ৭১-তম পর্যায় (round)।

৩। ভারত সরকারের উচ্চশিক্ষার উপর *সমগ্র ভারতব্যাপী সমীক্ষা*, ২০১১-১২, ২০১৪।

৪। *পশ্চিমবঙ্গে প্রারম্ভিক শিক্ষা*—ড. শচীনন্দন সাউ, অশোক পাল (২০১৩)। যশোড়া বিদ্যাসাগর মানব বিকাশ কেন্দ্র, যশোড়া, পূর্ব মেদিনীপুর।

৫। "Curriculam Development in Elementary English Education in the Era of Globalisation in West Bengal—Dr. Sachinandan Sau, Prasanta Samanta & Nikhilesh Ghosh. *Indian Journal of Educational Research (2016)*

Scanned with CamScanner